



ঈর্ষার বিবর্তন এবং রুমানা মঞ্চুর উপাখ্যান অভিজিৎ রায়

আছে ভালবাসা, আছে ঈর্ষা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে , ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হন্দয়ে আমার;
দূর থেকে দূর আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে? -তার সাথে! ...

‘আকাশলীনা’ নামের কবিতায় ঈর্ষাপরায়ণ চরিত্রের এক অসাধারণ চিত্রায়ণ করেছেন কবি জীবনানন্দ দাস, যে কবিতায় ঈর্ষাকাতর প্রেমিক অন্য যুবকের সাথে সুরঞ্জনার কথা বলা নিয়ে চিন্তিত, ঈর্ষান্বিত। হ্যাঁ - প্রেম যেমন আছে, তেমনি আছে ঈর্ষাপরায়ণতা। আমি সম্প্রতি মৃক্ষমনায় ‘সথি, ভালবাসা কারে কয়?’ নামে একটি ছয় পর্বের ব্লগ-সিরিজ লিখেছিলাম। প্রথম পর্বটি প্রাকাশিত হয়েছিলো এ বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইন ডে তথা ভালবাসা দিবসে[১]। শেষ পর্বটি প্রাকাশিত হয়েছে জুলাই মাসের ১৮ তারিখে[২]। সিরিজটির পঞ্চম পর্বে আমি ঈর্ষা এবং এর বিবর্তন নিয়ে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কথা বলেছিলাম[৩]। কীভাবে এবং কেন ঈর্ষাপরায়ণতার মত একটি বৈশিষ্ট্য জৈবিকভাবে মানব সমাজে উদ্ভৃত হল, এর অনুসন্ধান করাই ছিল প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। লেখাটির শেষ অংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারি অধ্যাপক রূমানা মঞ্চুরের উপর ঘটে যাওয়া নৃশংসতা নিয়েও আলোচনা করেছিলাম। মুক্তান্বেষার এবারের সংখ্যার প্রোসঙ্গিকতা বিবেচনায় আমার সে দিনকার বিশ্লেষণগুলো পেশ করব বলে মনস্ত করেছি। সে-সাথে থাকবে কিছু সংযোজন বিয়োজন।

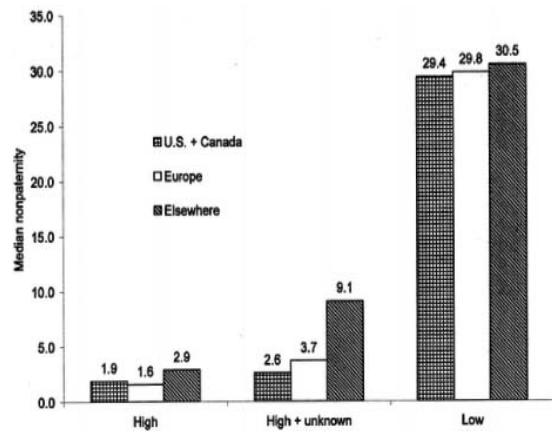
প্রেমের মত ঈর্ষাপরায়ণতার ব্যাপারটা ও মানুষের মজাগত। একত্রফাতাবে প্রেম কখনোই কোথাওই হয় না, প্রেমে ছলনা আছে, আছে প্রতারণা। আর ছলনা বা প্রতারণা থাকলে থাকবে ঈর্ষা, থাকবে ঘৃণা, এবং ক্ষেত্রবিশেষে জিঘাংসাও। শুনতে যতই খারাপ লাগুক- ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঈর্ষা বা জিঘাংসার মত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যও হয়েছে প্রেমের মতই একই বিবর্তনীয় যাত্রাপথে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের এগুলো নিয়েও সঙ্গত কারণেই গবেষণা করতে হয়। ডেভিড বাস তাঁর বই ‘ভয়ঙ্কর আবেগ : প্রেম এবং যৌনতার মধ্যে ঈর্ষাও জড়িত থাকে কেন?’ নামের বইয়ে দেখিয়েছেন, কেউ প্রেমে প্রতারণা করলে আমরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠি। ঈর্ষা আসলে একটি সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজি - বেঁচে থাকার এক সুচূরু পরিকল্পনা। আসলে বিবর্তনের ধারাবাহিকতাতেই ভালবাসার মত ঈর্ষার বীজও মানুষের মনে তৈরি হয়েছে, এর পরিস্কৃতন ঘটেছে। আমাদের বর্তমান মানসিকতার মধ্যে ঈর্ষার বীজ দেখে বোৱা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও ঈর্ষা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। যাদের মধ্যে ঈর্ষা ছিল না তাঁরা প্রজননগতভাবে সফল ছিলো না, তারা কেৱল উভৰসূরী রেখে যান নি[৪]। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের সবাইকে ঈর্ষাপরায়ণ হিসেবে বড় হতে হবে, আর কাউকে দেখলেই ঈর্ষান্বিত হতে হবে। ঈর্ষার ব্যাপারটা বহুলাংশেই সময় এবং পরিস্থিতি নির্ভর। বিবর্তনের কৌশল সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, এছাড়া বিবর্তনের কৌশলজনিত যেকোন মানবিক বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে পরিসংখ্যানিক সীমায় বিস্তৃত, কারও ক্ষেত্রে কম, কারও ক্ষেত্রে বেশি।



চিত্র: আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও ঈর্ষা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। যাদের মধ্যে ঈর্ষা ছিল না তাঁরা প্রজননগতভাবে সফল ছিলো না, তাঁরা কোন উত্তরসূরী রেখে যান নি।

তবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন ঈর্ষা এবং প্রতারণার রকম ফের নারী-পুরুষে ভিন্ন হয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অনুকল্প অনুযায়ী যৌনতা সংক্রান্ত হিংসা কিংবা ঈর্ষার ব্যাপারটি আসলে জৈবিকভাবে (biologically) অনেকটাই পুরুষদের একচেটিয়া, যাকে বলে - ‘ক্ষেসুয়াল জেলাস’ বা যৌন-ঈর্ষা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে - কেবল পুরুষদেরই যৌন-ঈর্ষা থাকবে কেন? কারণ হচ্ছে, সঙ্গমের পর গর্ভধারণ এবং বাচ্চা প্রসবের পুরো প্রক্রিয়াটা নারীরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে, পুরুষদের আর কোন ভূমিকা থাকে না। ফলে পুরুষরা নিজেদের পিতৃত্ব নিয়ে কখনোই ‘পুরোপুরি’ নিশ্চিত হতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি - আধুনিক ‘ডিএনএ’ টেস্ট আসার আগ পর্যন্ত কোন পুরুষের পক্ষে একক্ষণ্ঠ ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা সম্ভব ছিলো না যে সেই তার সন্তানের পিতা। কিন্তু মাতৃত্বের ব্যাপারটা তা নয়। মাকে যেহেতু গর্ভধারণ করতে হয়, প্রত্যেক মা-ই জানে যে সেই তার সন্তানের মা। অর্থাৎ, পিতৃত্বের ব্যাপারটা শতভাগ নিশ্চিত না হলেও মাতৃত্বের ব্যাপারটা নিশ্চিত। এখন চিন্তা করে দেখি - আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন বনে জঙ্গলে ছিলো অর্থাৎ শিকারী-সংগ্রাহক হিসেবে জীবন চালাতো, তখন কোন সুনির্ভুক্ত একগামী পরিবার ছিলো না। ফলে পুরুষদের আরো সমস্যা হত নিজেদের ‘পিতৃত্ব’ নিয়ে। পিতৃত্বের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, কারণ বিবর্তনের স্বার্থপর জিনের (selfish gene) ধারকেরা স্বার্থপরভাবেই চাইবে কেবল তার দেহেরই প্রতিলিপি তৈরি হোক। কিন্তু চাইলেই যে নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে তা তো নয়। সম্পর্কে প্রতারণা হয়। তার স্ত্রী যে

অন্য কারো সাথে সম্পর্ক তৈরি করে গর্ভ ধারণ করবে না, তা সে কীভাবে নিশ্চিত করবে? আদিম বন-জঙ্গলের কথা বাদ দিই, আধুনিক জীবনেও কিন্তু প্রতারণার ব্যাপারটা অজানা নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকায় শতকরা প্রায় ১৩ থেকে ২০ ভাগ পুরুষ অন্যের সন্তানকে ‘নিজ সন্তান’ ভেবে পরিবারে বড় করে। জার্মানিতে সেই সংখ্যা ৯ থেকে ১৭ ভাগ। সারা বিশ্বেই মোটামুটিভাবে নন-জেনেটিক সন্তানকে নিজ সন্তান হিসেবে বড় করার হার শতকরা ৯ থেকে ১৫ ভাগ বলে মনে করা হয়[৫]। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অন্যের (অর্থাৎ নন-জেনেটিক) সন্তানকে নিজ সন্তান ভেবে বড় করার এই প্রতারণাকে বলা হয় কাকোল্ড (cuckoldry), যার বাংলা আমরা করতে পারি - কোকিলাচরণ[৬]।



চিত্র: সারা বিশ্বেই মোটামুটিভাবে নন-জেনেটিক সন্তানকে নিজ সন্তান হিসেবে বড় করার হার কোকিলাচরণ) শতকরা ৮ থেকে ১৫ ভাগ বলে মনে করা হয়। যে সমস্ত পুরুষেরা নিজেদের পিতৃত্ব নিয়ে সন্দিহান (উপরের গ্রাফে লো কনফিডেন্স গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত), তাদের পরিবারে নন-জেনেটিক সন্তান বেশি পাওয়া গেছে, প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ[৭]।

এখন কথা হচ্ছে, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রভাব কী? প্রভাব হচ্ছে, কাকোল্ড বা কোকিলাচরণ ঘটলে সেটা পুরুষের জন্য এক ধরণের অপচয়। কারণ সে ভুলভাবে অন্যের জিনের প্রতিলিপি নিজের প্রতিলিপি হিসেবে পালন করে শক্তি বিনষ্ট করবে। এর ফলে নিজের জিন জনপুঁজে না ছড়িয়ে সুবিধা করে দেয় অন্যের জিন সঞ্চালনের, যেটা ‘সেলফিশ জিন’ প্রারতপক্ষে চাইবে না ঘটতে দিতে। ফলাফল হচ্ছে, পুরুষেরা মূলত ‘সেক্সুয়াল জেলাস’ হিসেবে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বেড়ে উঠে। তারা নিশ্চিত করতে চায় যে, তার যৌনসঙ্গী বা স্ত্রী, কেবল তার সাথেই সম্পর্ক রাখুক, অন্য পুরুষের সম্পর্ক এড়িয়ে কেবল তার সাথেই চলুক। এইটা বজায় রাখতে পারলেই সে শতভাগ না হোক, অস্তত কিছুটা হলেও নিশ্চয়তা পাবে যে, তার এই সম্পর্কের মধ্যে

কোকিলাচরণ ঘটার সম্ভাবনা কম। এজন্যই ইসলামি দেশগুলোতে কিংবা অনুরূপ ট্রেডিশনাল সমাজগুলোতে মেয়েদের হিজাব পরানো হয়, বোরখা পরানো হয়, কিংবা গৃহে অবরুদ্ধ রাখা হয়, কিংবা বাইরে কাজ করতে দেওয়া হয় না - এগুলো আসলে প্রকারান্তরে পুরুষতাত্ত্বিক ‘সেক্সুয়াল জেলাসি’-রই বহিঃপ্রকাশ।

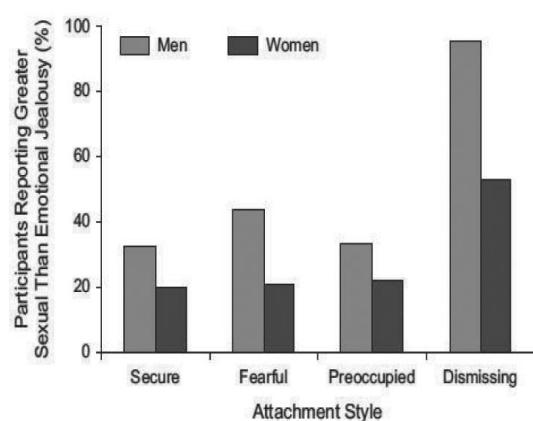


চিত্র: ইসলামি দেশগুলোতে কিংবা অনুরূপ সনাতন সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের যে হিজাব পরানো হয়, বোরখা পরানো হয়, কিংবা গৃহে অবরুদ্ধ রাখা হয় - এগুলো আসলে প্রকারান্তরে পুরুষতাত্ত্বিক ‘সেক্সুয়াল জেলাসি’-রই বহিঃপ্রকাশ।

আসলে নারীকে অন্তরীণ করে, তাদের অধিকার এবং মেলামেশা সীমিত করার মাধ্যমে সে-সব দেশে পুরুষেরা নিশ্চিত করতে চায় যে, কেবল তার জিনের প্রতিলিপিই তার স্ত্রীর শরীরে তৈরি হোক, অন্য কারো নয়। কারণ স্ত্রীর কোকিলাচরণ ঘটলে সেটা তার জন্য হয়ে উঠে সময় এবং অর্থের অপচয়। পুরুষালী ঈর্ষার মূল উৎস এখানেই। ডেভিড বাস তার ‘Human Mating Strategies’ শীর্ষক গবেষণাপত্রে সেজন্যই লিখেছেন[৮] -

‘যেহেতু মানব শুক্রাণু দিয়ে ডিমাণুর নিষেকের পুরো প্রক্রিয়াটিই নারীর দেহাভ্যন্তরে ঘটে, পুরুষের মধ্যে নিজের সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে সন্দেহ স্থিত হতে পারে। অপর পক্ষে মাত্তৃ নিয়ে একটি নারীর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, এখানে নিশ্চয়তা শতভাগ, তা সেটা যে শুক্রাণু দিয়েই নিষিক্ত হোক না কেন! কাজেই যৌনতার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততা কেবল একটি পুরুষের জেনেটিক পিতৃত্ব থেকে বর্ণিত করতে

পারে, নারীর মাত্তৃত্ব থেকে নয়। ... এসকল কারণে, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, যৌনতার অবিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কোন আলামত পাওয়া গেলে নারীদের চেয়ে পুরুষেরাই অধিকতর বেশি মনঃক্ষণ হবে’।



চিত্র: অধ্যাপক ডেভিড বাসসহ অন্য গবেষকেরা তাদের গবেষণায় দেখেছেন পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অনেক বেশি ‘সেক্সুয়াল জেলাসি’তে ভোগে। যৌনতার অবিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কোন আলামত পাওয়া গেলে নারীদের চেয়ে পুরুষেরাই অধিকতর বেশি মনঃক্ষণ হয়।

পুরুষেরা বেশি মনঃক্ষণ হবে কারণ, বিবর্তনীয় পরিভাষায় প্রতারিত পুরুষের সঙ্গি গর্ভধারণ করলে তাকে অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে অন্যের সন্তানের পেছনে অভিভাবকত্বাত্মক বিনিয়োগ করতে হবে, যার মূল্যমান জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বলে মনে করা হয়। মূলত তার অভিভাবকত্বের পুরোটাই বিনিয়োগ করতে হবে এমন সন্তানের পেছনে যার মধ্যে নিজের কোন বংশানুর ধারা বহমান নেই। স্বার্থপর জিনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এক ধরণের অপচয়ই বটে। নিজের পিতৃত্বের ব্যাপারে সংশ্রী থাকতে হওয়ায় বিবর্তনীয় যাত্রাপথে পুরুষের মানসপট যৌনতার ব্যাপারে ঈর্ষাণ্বিত হয়ে গড়ে উঠেছে, কিন্তু নারীরা মাতৃত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকায়, তা হয়নি[৯]।

অবশ্য স্বার্থপরভাবে নিজের জেনেটিক ধারা তার সঙ্গীর মাধ্যমে যেন বাহিত হয়, তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। যেমন, পুরুষ ভেলিড মাকড়শা (veliidae water spider) তার সঙ্গিকে কজা করার পর কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত শুয়ে থাকে, যাতে সঙ্গম করুক আর নাই করুক, অস্তত অন্য পুরুষ

মাকড়শা যেন তার সঙ্গীর দখল নিতে চেষ্টা না পারে। *Plecias nearcticas* নামের এক ধরণের পতঙ্গের (জনপ্রিয়ভাবে ‘লাভ বাগ’ হিসেবে পরিচিত) নিষেকের ক্ষেত্রেও পুরুষ পতঙ্গটি বেশ কয়েকদিন ধরে স্ত্রী পতঙ্গটিকে জড়িয়ে ধরে রাখে, যাতে অন্য কোন পতঙ্গ এসে এর নিষেক ঘটাতে না পারে। আবার, এক ধরণের ফলের মাছি আছে যাদের শুক্ররসের মধ্যে একধরণের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা স্ত্রী-যৌনিতে গিয়ে পূর্বাপর সকল শুক্রাণুকে ধ্বংস করে দেয়, এবং প্রকারাত্তরে নিশ্চিত করতে চায় যে কেবল তার শুক্রাণু দিয়েই নিষেক ঘটে[১০]। কিছু মথ এবং প্রজাপতির ক্ষেত্রে শুক্ররসের মধ্যে বিদ্যমান কিছু রাসায়নিক পদার্থ ‘সঙ্গম রোধনী’ (copulatory plug) হিসেবে কাজ করে। এর ফলে যৌনির মধ্যে শুক্রাণু ঢুকে ডিঘাণুর প্রবেশপথে অনেকটা আঠার মত আটকে থাকে যেন পরে অন্য কোন পুরুষের শুক্রাণু সেঁধিয়ে গিয়ে বোপ বুঝে কোপ মারতে না পারে! তবে সবচেয়ে চরম উদাহরণ আমি পেয়েছি *Johannseniella nitida* নামের এক ধরণের মাছির ক্ষেত্রে, সঙ্গম শেষে যাদের পুরুষের লিঙ্গ ভেঙ্গে ভিতরে রয়ে যায়। এ যেন অনেকটা সঙ্গমাত্মে নারীর যৌনী ছিপি দিয়ে আটকে দেওয়া - যেন অন্য প্রতিযোগীরা এর পূর্ণ সম্মত্বার করতে না পারে। যদিও কাট পতঙ্গের সাথে মানুষের পার্থক্য উল্লেখ করার মতই বিশাল, কিন্তু তারপরেও সঙ্গীকে নিজের অধিকারে রাখার ব্যাপারে স্ট্র্যাটিজিগতভাবে মিল লক্ষ্যনীয়[১১]। দুর্ভাগ্যবশত অন্য পতঙ্গের মতো মানুষের শুক্রাণুতে সঙ্গমরোধনী আঠাও নেই, কিংবা পুরুষাঙ্গ ভেঙ্গে যৌনীতেও থেকে যায় না, তবে বিভিন্ন সমাজে পর্দা, বোরখা আর হিজাবের বেপরোয়া প্রয়োগ দেখা যায় বৈকি। এগুলো তো এক ধরণের ছিপিই বলা চলে, কারণ এর মাধ্যমে পুরুষেরা নিশ্চিত করতে চায় যে, এ নারী অন্যের কামুক দৃষ্টি এড়িয়ে কেবল তারই অধিকারভূত হয়ে থাকুক।

পুরুষদের ঈর্ষার ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু মেয়েদেরটা? মেয়েদেরও ঈর্ষা হয়, প্রবলভাবেই হয় - তবে, বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হল - সেটা ঠিক ‘সেক্সুয়াল জেলাসি’ নয়। মেয়েরা বিবর্তনীয় পটভূমিকায় একজন পুরুষকে রিসোর্স বা সম্পদ হিসেবে দেখে এসেছে। কাজেই একজন পুরুষ একজন দেহাপসারিনীর সাথে যৌনসম্পর্ক করলে মেয়েরা যত না ঈর্ষারিত হয়, তার চেয়ে বেশি হয় তার স্বামী বা পার্টনার কারো সাথে রোমান্টিক কিংবা ‘ইমোশনাল’ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে। ডেভিড বাস, ওয়েসেন এবং লারসেনের নানা গবেষণায় এর সত্যতা মিলেছে [১২]। এখানে আমি আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার উল্লেখ করব। প্রাথমিক একটি গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালের একটি গবেষণাপত্রে[১৩]। ২০ জন পুরুষ এবং ২০ জন নারীকে নিয়ে পরিচালিত সেই গবেষণায় ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার বিভিন্ন উপলক্ষ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হয়।

অপশনগুলোর মধ্যে তার সঙ্গীর অন্য কারো সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন থেকে শুরু করে সঙ্গীর সময় এবং সম্পদ অন্য কারো জন্য বরাদ্দ করার মতো সব পথই খোলা ছিলো। দেখা গেলো বিশ জন নারীর মধ্যে সতের জনই সেই অপশন বাছাই করেছে যেখানে তার সঙ্গী অন্য কারো জন্য নিজের সময় এবং সম্পদ ব্যয় করছে। কিন্তু অন্য দিকে বিশ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে যৌল জনই অভিমত দিয়েছে তার সঙ্গী অন্য কারো সাথে যৌনসম্পর্ক গড়ে তুললে সেটা তাকে সবচেয়ে বেশি ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলবে। এধরনের আরেকটি গবেষণা সত্ত্বুরের দশকে চালানো হয়েছিলো পনেরটি দম্পতির মধ্যে[১৪]। সে গবেষণা থেকেও একই ভাবে উঠে এসেছিলো যে, পুরুষের ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠে যদি তার সঙ্গীর সাথে কোন ত্তীয়পক্ষের যৌনসম্পর্কের কোন আলাদাত পাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, তারা বেশি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠে তার সঙ্গী অন্য কোন মেয়ের সাথে আবেগী কিছু করলে - যেমন টাংকি মারা, রোমান্টিক সম্পর্কে জড়ানো, চুম্ব খাওয়া, এমনকি এগুলো কিছু না করে তার সঙ্গী পুরুষটি অন্য নারীর সাথে কেবল দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেও সে দুর্বাপ্তি হয়ে উঠে। এ গবেষণাগুলো থেকে বোঝা যায়, ছেলেরা তার সঙ্গী কারো সাথে কতটুকু কথা বললো না বললো তা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে না, যতটো থাকে সঙ্গীর যৌনতার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে। কিন্তু অন্যদিকে মেয়েদেরটা একটু ভিন্ন। তাদের সঙ্গী অন্য কোন মেয়ের জন্য কতটুকু সময় এবং সম্পদ ব্যয় করলো, তা তাদের উদ্বিগ্ন করে তুলে।

এ ব্যাপারে বড়সড় গবেষণা করেছেন অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড বাস। ৫১১ জন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে চালানো এ গবেষণায় তাদের কল্পনা করতে বলা হয় যে, তার সঙ্গী কারো সাথে যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়েছে কিংবা কারো সাথে মানসিক আবেগময় এক ধরণের সম্পর্ক তৈরি করেছে। কোন ব্যাপারটা তাকে বেশি ঈর্ষাকার করে তুলবে? প্রায় ৮৩ শতাংশ নারী মনে করেছে তার সঙ্গী তাকে না জানিয়ে অন্য কোন মেয়ের সাথে আবেগময় সম্পর্ক গড়ে তুললে সেটা তাকে ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলবে, কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটে সেটি মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ। অন্যদিকে শতকরা ৬০ ভাগ ছেলে মত দিয়েছে তার সঙ্গী তার সাথে বিশ্বাসযাতকতা করে অন্য কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুললে সেটা তাকে চরম ঈর্ষাকার করে ফেলবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা পাওয়া গেছে মাত্র ১৭ ভাগ[১৫]। বাসের এই ফলাফল কেবল আমেরিকার গবেষণা থেকে পাওয়া গেলোও পরবর্তী সময়ে কোরিয়া, জাপান, চীন, সুইডেনসহ অনেকে দেশেই একই ফলাফল পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছে[১৬]। একই ধরণের ফলাফলের দাবি এসেছে হাস্পেরি, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, সোভিয়েত রাশিয়া এবং যুগোস্লাভিয়াতে চালানো সমীক্ষা থেকেও [১৭]। তাই

বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন নারী-পুরুষে এই ঈর্ষাগত পার্থক্য সমগ্র মানব জাতির মধ্যেই পারিসাংখ্যিক পরিসীমায় বিস্তৃত। ধারণা করা হয় বিবর্তনের দীর্ঘদিনের যাত্রাপথে নিজের সঙ্গীকে ধরে রাখার অভিপ্রায়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে ঈর্ষা প্রদর্শন করে প্রজননগত সফলতা পেয়েছিল, তার বিবিধ ছাপই দেখা যায় আজকের নারী পুরুষদের মানসপটে। বলা বাহ্য, নারী এবং পুরুষেরা ভিন্নভাবে সঙ্গী নিজেদের আয়ত্তে রাখার কৌশল করায়ত করেছিলো; সেই পার্থক্যসূচক অভিযোগিণুলোই স্পষ্ট হয় নারী পুরুষের ঈর্ষাকেন্দ্রিক মনোভাব ঠিকমতো বিশ্লেষণ করলে।

তবে সবাই যে অধ্যাপক বাসের এ উপসংহারণগুলোর সাথে একমত পোষণ করেছেন তা নয়। যেমন নর্দার্ন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডেভিড বুলার। তিনি তার ‘অভিযোজনরত মন’ (Adapting Minds) বইয়ে[১৮] এবং বেশ কিছু প্রবন্ধে অধ্যাপক বাসের ঈর্ষা সংক্রান্ত গবেষণাগুলোর পদ্ধতিগত সমালোচনা হাজির করেছেন[১৯]। পুরুষেরা কেবল সঙ্গীর যৌনতার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার সন্ধান পেলেই কেবল ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন, অন্য কিছুতে তেমন নয় বলে বাস যে অভিমত দিয়েছেন, তা সঠিক নয় বলে বুলার মনে করেন। আমরা জীবনানন্দ দাসের আকাশলীনা কবিতায় দেখেছি সুরঞ্জনা এক অচেনা যুবকের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নয়, কেবল কথা বলাতেই উদ্বিধু হয়ে উঠেছে। এ ধরণের অনেক পুরুষই আমাদের চারপাশে আছে। আবার যৌনতার ব্যাপারেও উদার পুরুষের সংখ্যাও কম নয়। যেমন, অধ্যাপক বাসের গবেষণা থেকেই উঠে এসেছে, জার্মানি কিংবা নেদারল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে যৌনতার ব্যাপারগুলো অনেক শিথিল, সেখানে পুরুষেরা সঙ্গীর যৌনতার ব্যাপারে অনেক কম ঈর্ষাপ্রায়ণ থাকেন। কোরিয়া এবং চীনের মানুষদের উপর গবেষণা করেও দেখা গেছে সেখানকার পুরুষেরা সঙ্গীর যৌনতার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার আলামত পেলে অন্য অনেক দেশের পুরুষদের মতো খুব বেশি মনক্ষুণ্ণ হন না। আবার নারীদের ক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে যে উপসংহার (তারা কেবল সঙ্গীর রোমান্টিক কিংবা ‘ইমোশনাল’ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াকে বেশি গুরুত্ব দেয়, সঙ্গীর রোমাসবিহীন যৌন সম্পর্ককে নয়) টানা হয়েছে, সেটাও কতটুকু নিশ্চিত সে-প্রক্ষেত্রে থেকেই যায়। আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি ক্যালিফোর্নিয়ার ভূতপূর্ব গর্ভনর এবং খ্যাতিমান অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার এবং তার স্ত্রী মারিয়া শ্রাইভারের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে। আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে তার বাসার গৃহপরিচারিকার সাথে যৌনসম্পর্ক রেখেছিলেন। এমন নয় যে, শোয়ার্সনেগার পরিচারিকার সাথে কোন ‘রোমান্টিক সম্পর্কে’ জড়িয়েছিলেন। যৌনতার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার আলামত পাওয়াতেই মারিয়া শ্রাইভার শোয়ার্সনেগারকে ছেড়ে

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা

সঙ্গীর যৌন-অবিশ্বস্ততাকে খুব

গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করে,

অধিকাংশ পুরুষের মতোই।

তাই অধ্যাপক বুলারের মতে,

বিবর্তন পুরুষ ও নারীর মধ্যে

ঈর্ষার কোন ‘আলাদা

মেকানিজম’ তৈরি করেনি, বরং

নারী পুরুষ উভয়েই ঈর্ষাকেন্দ্রিক

একই মেকানিজমের অন্তর্ভুক্ত

হতে পারে, কেবল এর

পরিস্ফুটন পরিস্থিতিভেদে

ভিন্ন হয়।

চলে গেছেন।

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা সঙ্গীর যৌন-অবিশ্বস্ততাকে খুব গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করে, অধিকাংশ পুরুষের মতোই। তাই অধ্যাপক বুলারের মতে, বিবর্তন পুরুষ ও নারীর মধ্যে ঈর্ষার কোন ‘আলাদা মেকানিজম’ তৈরি করেনি, বরং নারী পুরুষ উভয়েই ঈর্ষাকেন্দ্রিক একই মেকানিজমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কেবল এর পরিস্ফুটন পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন হয়।

ঈর্ষার পরিণাম

এখন কথা হচ্ছে ঈর্ষার পরিণাম কীরকম হতে পারে? ছোট খাট সন্দেহ, বাগড়াঝাটি, দাম্পত্য কলহ, ডিভোর্স থেকে শুরু করে গায়ে হাত তোলা, মারধর থেকে শুরু করে হত্যা পর্যন্ত গড়াতে পারে, তা সবাই মোটামুটি জানেন। যেহেতু অধিকাংশ বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ‘সেক্সুয়াল জেলাসি’ জৈবিক কারণে পুরুষদেরই বেশি, তারাই পরকীয়া কিংবা কোকিলাচরণের কোন আলামত সঙ্গীর মধ্যে পেলে গড়পরতা বেশি সহিংস আচরণ করে।

সঙ্গী ‘অ্যাচিত’ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে এই সন্দেহ একজন ঈর্ষাপ্রায়ণ পুরুষের মনে দানা বাঁধলে তিনি কি করবেন? অনেক কিছুই করতে পারেন। হয়ত স্ত্রী বা সঙ্গী একা বাড়ি থেকে বেরলে গোপনে তার পিছু নেবেন, হয়তো অফিসে গিয়ে হঠাত করেই ফোন করে বসবেন এটা জানতে যে তার স্ত্রী বা সঙ্গী ঠিক এখন কী করছেন, খোঁজ-খবর নেবেন মার্কেটে

যাবার কথা বলে স্তৰী আসলেই মার্কেটে গিয়েছে নাকি ঢুকে গিয়েছে তার গোপন প্রেমিকের ঘরে। তিনি চোখে চোখে রাখবেন তার সঙ্গী কোন পার্টিতে, বিয়ে বাড়িতে কিংবা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গেলে কী করেন, কোথায় কার সাথে আড়ত মারেন। সঙ্গীর অবর্তনামে গোপনে তার ইমেইল পড়বেন, কিংবা সেলফোনের টেক্সটে নজর বুলাবেন, ইত্যাদি। এই আচরণগুলোর সমন্বিত একটি নাম আছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অভিধানে - ভিজিলেন্স (vigilance), এর বাংলা আমরা করতে পারি ‘শকুনচরণ’। শকুন যেমন উপর থেকে নজর রাখে তার শিকারের প্রতি, ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষের আচরণও হয়ে দাঁড়ায় তার সঙ্গীর প্রতি অনেকটা সেরকমের।

ভিজিলেন্সের পরবর্তী কিংবা ভিন্ন একটি ধাপ হতে পারে ভায়োলেন্স (violence) বা সহিংসতা। সহিংসতার প্রকোপ অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন হয়। কখনো সঙ্গীর গায়ে হাত তোলা, কখনো বা সন্দেহের তালিকাভুক্ত গোপন প্রেমিককে খুঁজে বের করে খেট করা, বাড়ি আক্রমণ করা, বেনামে ফোনে হমকি-ধামকি দেওয়া, কিংবা নিজে গিয়ে কিংবা গুঁগ লেলিয়ে পিটানো, প্রকাশ্যে হত্যা, গুরু খুন ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় আইনে ভিজিলেন্স বা শকুনচরণ অপরাধ না হলেও ভায়োলেন্স বা সহিংসতা অবশ্যই অপরাধ। অপরাধ হলেও এটা কিন্তু অনেক পুরুষেরই মনোসংজ্ঞাত স্ট্র্যাটিজি, যা তারা সুযোগ পেলেই ব্যবহার করেছে ইতিহাসের যাত্রাপথে সে কথা কারো অজানা নয়।

এ ক্ষেত্রে ১৯৮০ সালের দিকে পত্রপত্রিকায় সাড়া জাগানো ক্যানাডিয়ান মডেল এবং অভিনেত্রী ডরোথি স্ট্র্যাটেন হত্যার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনিন্দ্য সুন্দরী ডরোথি স্ট্র্যাটেন তখন কানাডার সেন্টিনিয়াল ইইস্কুলে পড়ছিলেন, আর বাড়ির পাশে ‘ডেইরি কুইন’ নামের ফাস্ট ফুড রেস্টুরায় কাজ করতেন। রেস্টুরায় কাজ করতে গিয়েই পল স্নাইডার নামে এক লোকের সাথে পরিচয় হয় তার। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের ভাবের আদান প্রদান, পরিচয় থেকে প্রণয় ডরোথি স্ট্র্যাটেনের বয়স তখন ১৭। আর স্নাইডারের ২৬। পরিচয়ের পর থেকেই স্নাইডার ডরোথিকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে ডেরোথির একটি চমৎকার সুন্দর মুখশী আর আকর্ষণীয় দেহবলুরী আছে, যা মডেল হবার জন্য একেবারে নির্ণুত। ডরোথি প্রথমে রাজী না হলেও স্নাইডারের চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে কিছু ছবি তুলেন। স্নাইডারই তোলেন সে ছবিগুলো তার নিজস্ব ক্যামেরায়। তারপর তা পাঠিয়ে দেন হিউ হেফনারের কাছে। হিউ হেফনার প্লে বয় ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা। স্নাইডার হেফনারের কাছ থেকে উন্নত পেলেন দুই দিনের মধ্যেই।

এরপরের সময়গুলো ডরোথি স্ট্র্যাটেনের জন্য খুবই পয়মন্ত। তিনি হিউ হেফনারের বিখ্যাত ‘প্লে বয় প্রাসাদে’ গিয়ে উঠলেন স্নাইডারকে সাথে নিয়ে। শুরু হল ডরোথির প্লে বয় মিশন।

তিনি ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত হলেন প্লে বয় ম্যাগাজিনের ‘মাসের সেরা প্লে মেট’ হিসেবে। ১৯৮০ সালে তিনি হন বর্ষসেরা। প্লেবয়ের পাঠককূল যেন আক্ষরিক অর্থেই ডরোথির পরিষ্কার চামড়া এবং প্রতিসাম্যময় দেহ, লাস্যময় কিন্তু নিষ্পাপ মুখশী, আর নির্মল চাহনি দিয়ে আবিষ্ট ছিলো সে-সময়। ডরোথি রাতারাতি বনে গেলেন তারকা। আর অন্যদিকে স্নাইডারের অবস্থা রইলো আগের মতোই- চাকরি-বাকরিবিহীন, হতাশাগ্রস্ত। হেফনারের কাছেও স্নাইডার তেমন কোন সহানীয় কিছু ছিলো না। একদিন প্লে বয় প্রাসাদ থেকে স্নাইডারকে তাড়িয়েই দেওয়া হল। প্রাসাদরক্ষীকে বলে দেওয়া হল, স্নাইডারকে যেন বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখা যায়।



চিত্র: ডরোথি স্ট্র্যাটেন (১৯৬০ - ১৯৮০)

এদিকে ডরোথিকে নিয়ে শুরু হল হেফনারের ম্যালা পরিকল্পনা। তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল হিলিউডের নায়ক, নায়িকা আর খ্যাতিমান পরিচালকদের সাথে। এদের মধ্যে ছিলেন হিলিউডের উঠতি পরিচালক পিটার বোগদানোভিচ। পিটার তখন ইতোমধ্যেই ‘পেপার মুন’ (১৯৭৩) আর ‘দ্য লাস্ট পিকচার শো’ (১৯৭১)’র মত জনপ্রিয় ছবি তৈরি করে ফেলেছেন। তিনি ডরোথিকে দেখেই তার ভবিষ্যৎ ছবির নায়িকা হিসেবে মনোনীত করে ফেললেন। ডরোথির জন্য এ যেন আকাশের চাঁদ পাওয়া। অবশ্য বর্ষসেরা প্লে বয় হিসেবে মনোনয়নের কারণে ইতোমধ্যেই ডরোথি পরিচিত হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন মহলে। তিনি অভিনয় শুরু করেছেন বাক রজার্স এবং ফ্যাটাসি আইল্যান্ডের মত তিবি সিরিয়ালে।

ডরোথির দিনকাল ভালই চলছিলো। পিটার বোগদানোভিচের ‘দে অল লাফড’ ছবিতে অভিনয় শুরু করেছেন। এটিই তার প্রথম ছবি। অন্যদিকে তার সঙ্গী পল স্নাইডার চাকরি-বাকরিবিহীন। গ্যামারাস ডরোথির পাশে চলচিত্র জগতে অচ্ছুৎ স্নাইডার ‘নিতান্তই বেমানান’ হয়ে উঠেছেন ক্রমশ।

কিন্তু তিনি তখনো ডরোথিকে বিয়ের জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডরোথিও প্রথমে না করেন নি, কারণ আফটার অল - পল স্লাইডারের কারগেই প্লেবয়ের মাধ্যমে তার খ্যাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল। ডরোথি স্লাইডারকে বিয়ে করতে রাজী হলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অনিবার্যভাবে প্রেমে পড়ে গেলেন পিটার বোগদানোভিচের। স্লাইডারকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন ডরোথি। তার সাথে বিচ্ছেদের চিন্তা শুরু করেছেন তিনি।

বেপরোয়া পল স্লাইডার শেষবারের মতো ডরোথির সাথে দেখা করতে চাইলেন। যদিও ডরোথির বন্ধুবাদৰ তাকে স্লাইডারের সাথে সকল ধরণের সম্পর্ক ছিল করতে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ডরোথি ভাবলেন - হোয়াট দ্য হেক, এই একবারই তো। তিনি ভাবলেন যে-মানুষটার সাথে এতদিনের একটা সম্পর্ক ছিল, যার কারণে তিনি এই খ্যাতির সিঁড়িতে তার সাথে দেখা করে কিছুটা কৃতজ্ঞতার ঝণ শোধ করলে ক্ষতি কী!

সেই ভাবাই তার জন্য কাল হল। ১৯৮০ সালের ১৪ই অগাস্ট ডরোথি স্লাইডারের সাথে দেখা করলেন। সাথে তার হ্যান্ড ব্যাগে নিলেন এক হাজার ডলার। ভাবলেন এ টাকাগুলো স্লাইডারের হাতে তুলে দিলে স্লাইডারের রাগ ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও কমবে, আর তা ছাড়া চাকরি-বাকরিবিহীন স্লাইডারের টাকার দরকার নিঃসন্দেহে। কিন্তু স্লাইডারের মাথায় ছিল ভিন্ন পরিকল্পনা। তিনি তার শটগান ডরোথির মাথায় তাক করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করলেন। হত্যা করলেন ডরোথিকে। পুলিশ পরে বাসায় এসে রক্তের বন্যায় ভেসে যাওয়া ডরোথির নিখর দেহ আবিক্ষার করল। যে নির্মল চাহনি আর নিষ্পাপ মুখশী এতোদিন আবিষ্ট করে রেখেছিল ডরোথির ভঙ্গদের, হাজার হাজার ম্যাগাজিনের কভার পেজে যে মুখের ছবি এতোদিন ধরে আগ্রহভরে প্রকাশ করেছেন পত্রিকার প্রকাশকেরা, সেই মুখ বিধ্বস্ত। রক্তস্নাত বিকৃত মুখ, ফেটে যাওয়া মাথার খুলি আর এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়া মগজের মাঝে পড়ে থাকা নগ্ন দেহ ডরোথির। দেহে নির্যাতন আর ধর্ষণের ছাপও ছিলো খুব স্পষ্ট। স্লাইডারের ঈর্ষাপরায়ণতার মর্মান্তিক বলি হলেন ডরোথি। ভাগ্যের কি নির্মল পরিহাস - মৃত্যুর কিছুদিন আগের এক সাক্ষাৎকারে ডরোথি তার সবচেয়ে অপচন্দনীয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন - ঈর্ষাপরায়ণতা! মাত্র বিশ বছর বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস ভালোবাসা ছেড়ে অজ্ঞানার পথে পাড়ি জমাতে হলো ডরোথিকে। স্লাইডার নিজেও আত্মহত্যা করেন ডরোথিকে হত্যার পর পরই। ব্যাপারটিকে সাদা চোখে জিয়াংসার জের বলে মনে হলেও সেটি আরেকটু গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ডরোথি ছিলেন সুন্দরী, কিন্তু নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তিনি তেমন সচেতন হয়তো ছিলেন না যখন তিনি ডেইরি কুইন রেস্তোরায় পার্ট টাইম কাজ করতেন। প্লে বয় ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা প্লে মেট নির্বাচিত হবার পরই তিনি বুবাতে পারেন যে তিনি পরিণত হয়েছেন বহু শিক্ষা-দীক্ষা গুণমান সম্মুখ রথী মহারথী

প্রতিযোগিতায় হেরে যাবার, অর্থাৎ এতদিনের সুন্দরী সঙ্গী ‘হাত ছাড়া’ হয়ে যাবার আশক্ষাই ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিলো স্লাইডারকে। ভিজিলেন্স থেকে তিনি চেঁচে নিয়েছিলেন ভায়োলেন্সের পথ। বিবর্তন মনেবিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তনীয় যাত্রাপথে নারীরা পুরুষ সঙ্গীদের এক ধরনের ‘সম্পদ’-এর যোগান হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে[২০]। অর্থবিত্ত, ভাল চাকরি, সামাজিক পদমর্যাদা, প্রভাবপ্রতিপত্তি পুরুষদের জন্য খুব বড় ধরণের মেটিং ভ্যালু।

পুরুষের হাঁট্বাবে। অর্থাৎ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাজারে ডরোথির ‘মেটিং ভ্যালু’ বেড়ে গিয়েছিলো অনেকগুণ। আর অন্যদিকে স্লাইডার ছিলেন চাল চুলোহাইন বেকার যুবক। তিনি অর্থবিত্তে বলীয়ান সামাজিক প্রতিপক্ষিশালী হেফনার কিংবা পিটার বোগদানোভিচদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবেন কেন? তার মেটিং ভ্যালু ছিলো পড়তির দিকে। প্রতিযোগিতায় হেরে যাবার, অর্থাৎ এতদিনের সুন্দরী সঙ্গী ‘হাত ছাড়া’ হয়ে যাবার আশক্ষাই ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিলো স্লাইডারকে। ভিজিলেন্স থেকে তিনি চেঁচে নিয়েছিলেন ভায়োলেন্সের পথ। বিবর্তন মনেবিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তনীয় যাত্রাপথে নারীরা পুরুষ সঙ্গীদের এক ধরনের ‘সম্পদ’-এর যোগান হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে[২০]। অর্থবিত্ত, ভাল চাকরি, সামাজিক পদমর্যাদা, প্রভাবপ্রতিপত্তি পুরুষদের জন্য খুব বড় ধরণের মেটিং ভ্যালু। কাজেই চাকরি হারানো কিংবা চাকরি না থাকার মানে সম্পদেও যোগান বন্ধ। মেয়েরা সঙ্গী নির্বাচনের সময় চাকরিদার এবং সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিওয়ালা ছেলেদের পছন্দ করে। এগুলো না থাকলে মেটিং ভ্যালু করে আসবে। স্লাইডারের ক্ষেত্রে ঠিক এটিই ঘটেছিলো। ব্যাপারটাকে সামাজিক স্টেরিওটাইপিং বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পুরুষদের জন্য চাকরি-বাকরি না করে বেকার বসে থাকাটা কোন অপশনই নয় বিয়ের বাজারে কিংবা সামাজিকভাবে, কিন্তু বহু সমাজেই মেয়েদের জন্য তা নয়। আমার ব্যক্তিগত জীবনের উদাহরণ টানি এ প্রসঙ্গে। স্বভাবে আমরা দু’জনেই ঘরকুনো হলেও মাঝে চাপে পড়ে আমাকে আর বন্যাকে মাঝে মধ্যেই কোন দেশি পার্টিতে যেতে হয় এই আটলান্টায়। অনেক সময়ই নতুন কারো সাথে দেখা হয়, পরিচয়ের এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় - ‘ভাই আপনি কোথায়

চাকরি করেন?’ বন্যার ক্ষেত্রে ঠিক তা হয় না। তার দিকে প্রশ্ন আসে - ‘আপা/ভাবী, আপনি কি বাসায় থাকেন নাকি চাকরি করছেন?’ এ থেকে বোবা যায় নারীদের ক্ষেত্রে চাকরি না করাটা একটা অপশন মনে হলেও ‘ভাল স্বামীর’ ক্ষেত্রে তা হয় না কথনেই, তা তিনি যতই শখের বসে বইপত্র লিখুন কিংবা ব্লগ করুন! সেজন্যই চাকরি না থাকলে একজন নারী যতটা না পীড়িত হয়, একজন পুরুষকে তার বেকার জীবন পীড়িত করে ঢের বেশি। তারা হয়ে উঠে হতাশাগ্রস্ত, এবং সর্বোপরি এই ভঙ্গুর সময়টাতেই তারা সঙ্গী হারানোর ভয়ে হয়ে উঠে চিন্তিত এবং ঈর্ষাওয়িত। জীববিজ্ঞানী রবিন বেকার এবং মার্ক বেলিস ইংল্যান্ডে চালানো তাদের একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, একজন বিবাহিত নারী যখন অন্য কোন পুরুষের সাথে পরকীয়ায় জড়ায়, সেই পুরুষের চাকরির স্ট্যাটাস, প্রতিপন্থি, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি তার বর্তমান স্বামীর চেয়ে সাধারণত বেশি থাকে[২১]। অন্য আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৬৪ ভাগ ক্ষেত্রে একজন পুরুষ তার সঙ্গীকে হত্যা করে যখন সে থাকে একজন বেকার ভ্যাগাবন্ড[২২]।

ঈর্ষার পরিণাম এবং রূমানা মঞ্জুর উপাখ্যান

আমি যখন এই অংশটি লিখছিলাম, তখন একটি আলোচিত ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্র এবং মিডিয়া ছিলো আলোচনার তুঙ্গে। ঘটনাটি হলো - বিটিশ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের সহকারি অধ্যাপক রূমানা মঞ্জুর দেশে থাকাকালীন তার স্বামী হাসান সাইদের হাতে রক্তাক্ত হয়েছেন, ক্ষতবিক্ষিত হয়েছেন। আঁচড়ে কামড়ে নাক টেঁট গালের মাংস খুলে নেওয়া হয়েছে। আঙুল ঢুকিয়ে তার চোখ উপত্তে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। রূমানাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাংলাদেশ এবং ভারতের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েও লাভ হয়নি, রূমানার দুটো চোখই অক্ষ হয়ে গেছে।



চিত্র : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারি অধ্যাপক রূমানা গত ৫ জুন স্বামী হাসান সাইদের মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হন।

হাসান সাইদের এই ‘পশুসূলভ’ আচরণে স্তুতি হয়ে গেছে সবাই। কী ভীষণ কৃৎসিং মন-মানসিকতা থাকলে সঙ্গনীকে কেবল মারধর নয়, রীতিমত নাক কান গাল কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়া যায়, চোখ উপত্তে নেবার চেষ্টা করা যায়! পত্রপত্রিকা, ফেসবুক আর ব্লগে চলছিলো আলোচনা, প্রতিবাদের ঝড়। কেউ দুর্ঘচেন পুরুষত্বকে, কেউ বা ধর্মকে, কেউ বা আবার দোষারোপ করছেন দেশের আইন কানুনকে। আবার কিছু মহল থেকে তাকে পাগল প্রতিপন্থ করার চেষ্টাও হয়েছে।



চিত্র : দু চোখ হারানো রূমানা মঞ্জুর সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলছেন।

না হাসান সাইদ পাগল-ছাগল কিছুই নন, বরং বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তিনি নারীর কাছে মেটিং ভ্যালু করে যাওয়া একজন হীনমন্য ঈর্ষাপ্রায়ণ পুরুষ - যার শকুনচরণ ক্রমশ রূপ নিয়েছিলো নিষ্ঠুর পুরুষালি সহিংসতায়। সাইদ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, সে বুয়েটের পড়ালেখা শেষ করতে পারেনি, ইটের ভাঁটা, সিএনজিসহ বিভিন্ন ব্যবসায় হয়েছে ব্যর্থ। সম্প্রতি শেয়ারেও খেয়েছে লোকসান। অন্যদিকে রূমানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সফল শিক্ষিকা, বিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের শেষ পর্যায়ে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে রূমানার মেটিং ভ্যালুর পারদ সাইদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বগামী। সত্য হোক মিথ্যে হোক সাথে যোগ হয়েছিল ইরানি যুবক তাহের বিন নাভিদ কেন্দ্রিক কিছু ‘রসালো’ উপাখ্যান। সঙ্গী হারানোর ভয়ে ভীত এবং ঈর্ষাওয়িত সাইদ ঝাগড়া বিবাদ কলহের ত্রুপ পার হয়ে একদিন নরপতির মতোই ঝাপিয়ে পড়েছে রূমানার উপর। হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে তার দেহ করে ফেলেছে ক্ষতবিক্ষিত। মুক্তমনায় লীনা রহমান ‘রূমানা মঞ্জুর ও নরকদর্শন’ শীর্ষক একটি চমৎকার লেখা লিখেছেন[২৩]। লেখাটিতে সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি নিষ্কেপের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-নিষেধ যেগুলো নারীকে অবদমনের ক্রাড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো নিয়েও প্রাণবন্ত আলোচনা ছিলো। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। বস্তুত লীনার লেখাটির সাথে সামগ্রিকভাবে একমত হয়েও লেখাটির মন্তব্যে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম -

“রূমানার উপর অত্যাচারের পেছনে ধর্মের ব্যাপারটা কতটুকু জড়িত তা নিয়ে সন্দেহ আছে আমার। ধর্মের কারণে যে অত্যাচার হয় না তা নয়, অনেকই হয়, তবে রূমানার ক্ষেত্রে ধর্মের চেয়েও প্রবলতর ব্যাপারটি হচ্ছে পুরুষালী জিঘাংসা। নারী যখন স্বাবলম্বী হয়ে উঠে, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি এবং আর্থিক দিক দিয়ে তার সঙ্গীকে ছাড়িয়ে যায়, বহু পুরুষই তা মেনে নিতে পারে না। উচ্চশিক্ষায় রূমানার সফলতা সাঙ্গদের ক্ষেত্রে তৈরি করেছে এক ধরনের হীনমন্যতা, ঈর্ষা আর জিঘাংসা। তারই শিকার রূমানা”।

আমার বিশ্লেষণ যে ভুল ছিলো না, তা দেখা গিয়েছে জনকচ্ছে (১৮ই জুন ২০১১) প্রকাশিত প্রাথমিক রিপোর্টে। রিমান্ডের প্রথম দিনেই সাইদ স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো - ‘নিজ হীনমন্যতা থেকেই রূমানার চোখ উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল’[২৪]। রূমানা এপিসোডের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই আলোচনায় আসবে। পুলিশের হাতে দশদিন পর্যন্ত ধরা ছেঁয়ার বাইরে থাকা এই তথাকথিত স্বামী বৃঢ়িটি রূমানার চরিত্র হননে নেমেছিল। ফাঁদা হয়েছিলো মিথ্যে প্রেমিকের সাথে এক রসালো গল্প। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলো এগুলো রসালো চাটনির মতোই পরিবেশন করেছে। রাতারাতি কিছু মানুষের সমর্থনও কুড়াতে সক্ষম হলেন সাইদ। অনেকেই ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে শুরু করলেন ‘এক হাতে তালি বাজে না’। নিচয়ই কোন গড়বড় ছিলো। পরে অবশ্য সাইদ নিজেই স্বীকার করেছিল যে রূমানার পরকীয়ার গল্পগুলো বানানো, মিথ্য। আমরা আগেও দেখেছি এ ধরণের ক্ষেত্রে পুরুষদের একটাই অন্ত থাকে নির্যাতিত মেয়েটিকে যেকোনভাবে ‘খারাপ মেয়ে’ হিসেবে প্রতিপ্রয় করা। সেই যে ইয়াসমিনকে ধর্ষণ করেছিলো পুলিশেরা। এর পরদিন পুলিশেরা যুক্তির জাল বুনে বলেছিলো, ইয়াসমিন বেশ্যা, খারাপ মেয়ে, যেন ‘খারাপ মেয়ে’ প্রমাণ করতে পারলে খুন ধর্ষণ, চোখ খুবলে নেওয়া সব জায়েজ হয়ে যায়! আসলে সত্য কথা হল সাইদ বুঝতে পেরেছিলো খারাপ মেয়ে প্রমাণ করতে পারলে ‘পুরুষত্ব’কে সহজেই হাতে রাখা যায়। ওটাই ছিলো সাইদের তখনকার ‘সারভাইভাল স্ট্র্যাটিজি’। সেজন্যই আমরা দেখলাম যে রূমানাকে নিয়ে আগে বলা পরকীয়ার ব্যাপারগুলো নিজ মুখে অব্যাকার করার আগ পর্যন্ত বেশ কিছু মানুষের সহানুভূতি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন সাইদ। বাজারি পত্রিকা পড়ে তৈরি হওয়া জনমতের একটি বড় অংশ সাঙ্গদ দোষ-স্বীকারের আগ পর্যন্ত ক্রমাগত সন্দেহের তীর হেনেছে রূমানা মঞ্জুরের দিকে। শুধু পুরুষের নয়, এমনকি অনেক নারীও রূমানার প্রতি সন্দেহের ‘অনেক আলামত’ পেয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে

কিন্তু বোঝা যায় পুরুষতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা কেবল পুরুষদেরই আচ্ছন্ন করেনি, দীর্ঘদিনের কালিক পরিক্রমায় এটি অসংখ্য নারীর মানসপটেও রাজত্ব করেছে এবং এখনো করছে।

হ্যাঁ পুরুষতত্ত্বকে কবে গালি দেওয়া সহজ, কিন্তু কেন পুরুষতত্ত্বের মানসপট এভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা তেমন সহজ নয়। সহজ নয় এটি বিশ্লেষণে আনা যে পরকীয়া শুনলেই কেন জনচেতনার সহানুভূতিতে আঘাত লেগে যায়, সবাই মরিয়া হয়ে উঠে তার বিপরীতটা প্রমাণ করতে। রূমানার কলক্ষের কাউন্টার হিসেবে রূমানা কত নিষ্কলন্ক আর সতী-সার্বী মেয়ে সেটা প্রমাণ করতে আবার কিছু পত্রিকা ফলাও প্রচার শুরু করল - রূমানা কত মৃদুভাষী ছিলেন, তিনি দিনে পাঁচবেলা নামাজ পড়তেন, মাথায় কাপড় দিয়ে কানাডার প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করতেন, সেখানে প্রতিবেশীদের সাথে কত মিষ্টি ব্যবহার করতেন, কত ভাল রান্না করে তাদের খাওয়াতেন, বিদেশ বিভুইয়ে কত ভালভাবে ইসলামি মতাদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন, অন্য ছেলেদের সাথে তেমন মিশতেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষেই কানাডা থেকে স্বামী-স্বতানকে ফোন করার জন্য ছুটে আসতেন, বাইরে একদমই বেরতেন না ইত্যাদি। এ সবকিছুই আসলে সেই চিরচেনা মানসপটকে তুলে ধরে - নারীকে গড়ে উঠতে হবে পুরুষদের বানানো ছকে, কথায়-বার্তায় হতে হবে মৃদুভাষী, চলনে-বলনে শাস্ত-সৌম্য, মাথায় কাপড় টেনে চলতে হবে, স্বামী ইনমন্য কিংবা নপুংশক যাই হোক না কেন, তাকে নিয়েই থাকতে হবে, তার প্রতি থাকতে হবে সদা অনুগত।

পরকীয়া তো দূরের কথা, কোন ধরণের অবিশ্বস্ততার আলামত পেলে খুন-জখম কিংবা চোখ খুবলে নেওয়ার শাস্তি ও সামাজিকভাবে লম্ব হয়ে যায়। কারণ পুরুষের স্ত্রীদের অবিশ্বস্ততাকে প্রজননগতভাবে অধিকতর মূল্যবান বলে মনে করে। যেহেতু পিতৃতত্ত্বের মূল লক্ষ্য থাকে ‘সুনিশ্চিত পিতৃত্বে সন্তান উৎপাদন’ সেজন্য, পিতৃতাত্ত্বিক সমাজে জৈবিক এবং সামাজিক কারণেই স্ত্রীর পরকীয়াকে ‘হৃষকি’ হিসেবে দেখা হয়। স্ত্রী পরকীয়ার ঘটনা প্রকাশিত হয়ে গেলে স্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হয় মান-সম্মান, সামাজিক পদপর্যাদাসহ বহু কিছুতেই। তিনি সমাজে পরিগত হন ইয়ার্কি ফাজলামোর বিষয়ে। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়, অনেক দেশের জন্যই সত্য। এমনকি পাঠকেরা জেনে আবাক হবেন যে, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার টেক্সাসে এমন আইন চালু ছিল যে অবিশ্বস্ততার আলামত পেয়ে স্বামী যদি স্ত্রীকে হত্যা করে তবে সেটি কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না। প্রাচীন রোমে এমন আইন চালু ছিল যে, যদি স্বামীর নিজ গ্রহে পরকীয়া বা ব্যাভিচারের ঘটনা ঘটে, তবে স্বামী তার অবিশ্বস্ত স্ত্রী এবং তার প্রেমিকাকে হত্যা করতে পারবেন; ইউরোপের অনেক দেশে এখনো সেসব আইনের কিছু প্রতিফলন দেখা যায় [২৫]।

তিভ, সোগা, গিসু, নয়োরো, লুয়িয়া, লুয়ো প্রভৃতি আফ্রিকান রাজ্যে হত্যাকাণ্ডের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, সেখানে ৪৬ শতাংশ হত্যাকাণ্ডই সংগঠিত হয় যৌনতার প্রতারণা, অবিশ্বস্ততা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। একইভাবে, সুদান উগান্ডা এবং ভারতেও যৌন ঈর্ষা বা ‘সেক্সুয়াল জেলাসি’ বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার মূল কারণ বলে জানা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যখনই স্বামী কোন পরিকীয়ার আলামত পেয়েছে কিংবা স্ত্রী যখন স্বামীকে ত্যাগ করার হৃষি দিয়েছে তখনই সেই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে। সাইদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি স্বামীর সাথে বেশ কিছুদিন ধরেই রুমানার বাগড়াবাটি চলছিল। কলহের এক পর্যায়ে রুমানা উত্তেজিত হয়ে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে অপারগতাও প্রকাশ করেছিলেন। মূলত এরপর থেকেই রুমানাকে হত্যার পরিকল্পনা করে সাইদ। ২১ মে বেধরক মারধরের পর গলা টিপে রুমানাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এ সময় রুমানার চিকিৎসারে বাড়ির সবাই এগিয়ে গেলে সে যাত্রা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পরে পরিবারের হস্তক্ষেপে তা মিটমাট হয়। কিছুদিন পরে রুমানার মা মেহেরপুরে গ্রামের বাড়ি বেড়তে গেলে ৫ ই জুন সাইদ আবারো তাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। সে দিন সাইদ রুমানাকে ঘরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এ সময় উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সে রুমানার গলা টিপে ধরে। রুমানা সজারে আঘাত করে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। এ সময় সাইদের চোখের চশমা পড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে রুমানাকে বীভৎসভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে তার গাল, নাক, মুখসহ স্পর্শকাতর স্থানে কামড়াতে থাকে। সাইদ রুমানার নাকে কামড় দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। আঙুল ঢুকিয়ে চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে ...
 হ্যাঁ, আমরা সবাই সাইদের কৃতকর্মের শাস্তি চাই। কোন সুস্থ মাথার মানুষই প্রত্যাশা করবেন না যে এ ধরণের ন্যূনসং ঘটনা ঘটিয়ে সাইদ অবলীলায় মুক্তি পেয়ে যাক, তৈরি করক আরেকটি ভবিষ্যৎ-অপরাধের সুস্থিত ক্ষেত্র। বরং, তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কাম্য। কিন্তু সমাজে যখন নারী নির্যাতন প্রকট আকার ধারণ করে, যখন ন্যূনসভাবে একটি নারীর গাল নাক কামড়ে জখম করা হয়, রাতারাতি চোখ খুবলে নেওয়া হয়, এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোও আমাদের খুঁজে বের করা জরুরি। আমাদের বোঝা দরকার কোন পরিস্থিতিতে সাইদের মত লোকজনের আচরণ এরকম বিপজ্জনক এবং ন্যূনস হয়ে উঠতে পারে। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই কিন্তু সেগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে একটি সুন্দর পৃথিবী তৈরির প্রত্যাশাতেই এটা দরকার।

অভিজিৎ রায়, মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ সহ পাঁচটি বইয়ের লেখক। সর্বশেষ বই - অবিশ্বাসের দর্শন, শুন্দস্বর, ২০১১ (রায়হান আবীরের সাথে মিলে)। E-mail: charbak_bd@yahoo.com

তথ্যসূত্র :

- [১] অভিজিৎ রায়, ভ্যালেন্টাইস ডে : সখি, ভালবাসা কারে কয়? (১), মুক্তমনা, অন লাইন লিঙ্ক - http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=13650
- [২] অভিজিৎ রায়, সখি, ভালবাসা কারে কয়? শেষ পর্ব), মুক্তমনা, অন লাইন লিঙ্ক - http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=17687
- [৩] অভিজিৎ রায়, সখি, ভালবাসা কারে কয়? (৫), মুক্তমনা, অন লাইন লিঙ্ক - http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=16997
- [৪] David M. Buss , The Dangerous Passion: Why Jealousy Is As Necessary As Love and Sex, Free Press, 2000
- [৫] Who's your Daddy? Is it true 10-15% of children in modern society were not sired by their putative fathers? <http://www.straightdope.com/columns/read/2730/whos-your-daddy>; Also see - MacIntyre S., A. Sooman., Non-paternity and prenatal genetic screening. Lancet 338:869-871, 1991; R.R. Baker & M.A. Bellis, Human Sperm Competition: Copulation, Masturbation and Infidelity, Springer,1999
- [৬] কাকেন্ডি বা কোকিলাচরণ শব্দটি এসেছে কোকিলের অন্য পাখির বাসায় ডিম পেড়ে অন্য পাখিদের সাথে প্রতারণা করার উপর্যুক্ত থেকে। কোকিলেরা এভাবে অন্য পাখির সাথে প্রতারণা করে ডিমে তা দেওয়া কিংবা সন্তান লালন-পালনের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। মানুষের ক্ষেত্রে কোকিলাচরণের মাধ্যমে অন্য পুরুষের প্রণয়াসক্ত স্ত্রীটি স্বামীর নিজের সন্তান হিসেবে প্রতারিত করে সন্তান লালন-পালনে প্রলুক্ত করে।
- [৭] Kermyn G. Anderson, Reports : How Well Does Paternity Confidence Match Actual Paternity? Evidence from Worldwide Nonpaternity Rates, Current Anthropology 48(3):511-518.
- [৮] David Buss, Human Mating Strategies. Samfundsokonomien, 4, 47-58, 2002.
- [৯] Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade; Reprint edition, 2008
- [১০] T.R. Birkhead, and F.M. Hunter,

Mechanisms of sperm competition. Trends in Ecology and Evolution. 5:48-52,1990.

[১১] David M. Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books, 2003

[১২] Buss, D.M., Larsen, R.J., Westen, D., & Semmelroth, J. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology. Psychological Science , 3:251-5 'œ'

[১৩] M W Teismann, D L Mosher, Jealous conflict in dating couples, Psychol Rep. 1978 Jun;42(3 Pt 2):1211-6

[১৪] J. L. Francis, Toward the management of heterosexual jealousy, Journal of Marriage and Family, 10, 61-69, 1977

[১৫] David M. Buss , The Dangerous Passion: Why Jealousy Is As Necessary As Love and Sex, Free Press, 2000

[১৬] উদাহরণ হিসেবে দ্রষ্টব্য নীচের গবেষণাপত্রগুলো -
D.C. Geary, M. Rumsey, C.C. Bow-Thomas, & Hoard, M.K. Sexual jealousy as a facultative trait: Evidence from the pattern of sex differences in adults from China and the United States. Ethology and Sociobiology, 16, 355-383, 1995

M.W Wiederman,,, & E. Kendall, Evolution, gender, and sexual jealousy: Investigation with a sample from Sweden. Evolution and Human Behavior, 20, 121-128, 1999.

[১৭] David M. Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books, 2003

[১৮] David J. Buller, Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature, The MIT Press; 2005.

[১৯] David J. Buller, Sex, Jealousy & Violence: A Skeptical Look at Evolutionary Psychology, Skeptic, volume 12 number 1, On line :

http://www.skeptic.com/reading_room/sex-jealousy-and-violence/

[২০] এ ব্যাপারটি সঙ্গী নির্বাচনের মেটিং স্ট্র্যাটিজির সাথে জড়িত। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের সমীক্ষায় দেখা গেছে সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলেরা সঙ্গীর দয়া, সততা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলীর পাশাপাশি প্রত্যাশা করে তারণ্য এবং সৌন্দর্য।

অন্যদিকে মেয়েরাও গড়পরতা ছেলেদের কাছ থেকে দয়া,

বুদ্ধিমত্তা আশা করে ঠিকই, পাশাপাশি সঙ্গীর কাছ থেকে আশা করে ধন-সম্পদ আর স্ট্যাটাস।

[২১] R. R. Baker, , & , M. A. Bellis, Human sperm competition: copulation, masturbation, and infidelity. London: Chapman & Hall,1995.

[২২] P. Easteal, Killing the Beloved: Homicide Between Adult Sexual Intimates, AIC, 1993.

[২৩] লীনা রহমান, রূমানা মঙ্গুর ও নরকদর্শন, জুন ২০, ২০১১, মুক্তমনা

[২৪] নিজ হীনমন্ত্র থেকেই রূমানার চোখ উপড়ে ফেলতে চেয়েছি : রিমান্ডের প্রথম দিনে সাইদের ঘীকারোক্তি, দৈনিক জনকর্ত, ১৮ জুন, ২০১১

[২৫] Margo Wilson and Martin Daly, Homicide, Aldine Transaction, 1988

